International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-VI, November 2024, Page No.78-84
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i6.007

বাঁকুড়ার উৎকল সমাজ : প্রসঙ্গ 'পিঠে'

প্রদ্যোৎ কুমার হোতা
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 25.11.2024; Accepted: 29.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

There is a saying in Bengal that a foodie is a Bengali. Gives a different dimension to Bengali food or food intake. At present the community is Bengali in heart and soul. Fish and rice is the favorite food of Bengalis. Along with fish and rice, pithe-puli has increased Bengali's diet a million times. Bankura is one of the districts of West Bengal. Although people of different communities live in this district, the predominance of Utkal community is worth noting. This Utkal society is very advanced in culinary arts. There is a proverb in Bengali that 'cooks that bind the hair'. It is natural that they are masters of cooking and foodies. So Utkal society organizes different types of food to satisfy the hunger. Pithe-puli occupies an important place in the diet of the Utkal community. This Pithe-Puli variety has given the Utkal community a prominent place. The pies made by the Utkal community have satisfied the Bengali's thirst to a great extent. Not only one or two types of pitha made by the community, they also make satkahan of pitha. They have shown how many ways food can be eaten through their pies. Such as Potato Bara, Pumpkin Bara, Kopi Bara, Jackfruit Bara, Khaiye Bara, Ramar Bara, Taler Bara, Kakhra, Chit Pithe, Various Pithes of Tal etc. This topic has been discussed in detail in the main article.

Keywords: foodie, pithe, community, satkahan, raspipasa.

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম হল বাঁকুড়া। রাজ্যের অন্যান্য জেলার থেকে এই জেলার অধিবাসীরা আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, সংস্কার ও খাদ্যাভ্যাসের দিক থেকে এক স্বতন্ত্র্য অধ্যায় রচনা করেছেন। ভৌগোলিকভাবে যে অঞ্চলে বাঁকুড়া জেলার অবস্থান সেই পরিমণ্ডলে ঐতিহাসিক ভাবেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে থাকেন। যেমন - মাঝি, বাউরী, বাগদী, হাঁড়ি, মুচি, ডোম, সাঁওতাল, মুণ্ডা হো, মাহাত এবং ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে রয়েছেন মুখার্জী, চ্যাটার্জী, ব্যানার্জী, ভট্টাচার্য প্রভৃতি বাঙালি ব্রাহ্মণ এবং উৎকল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। এই উৎকল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিভিন্ন

পদবীধারী হিসাবে এই জেলার জনসংখ্যার মানচিত্রকে বিশিষ্টতা দান করেছেন। বর্তমানে জেলার মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪০ (চল্লিশ) লক্ষের অধিক। এই জনসংখ্যার মধ্যে উৎকল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন প্রায় ৩ লক্ষাধিক।

অনেক আলোচনা ও সমালোচনার অঙ্গ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উৎকল ব্রাহ্মণদের ওড়িশা থেকে আগত ব্রাহ্মণ বা ওড়িয়া ব্রাহ্মণ হিসাবে চিহ্নিত করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কিন্তু এ বিশ্লেষণ যথার্থ নয় কারণ উৎকল রাজ্যের সীমানা বিষয়ে যে ঐতিহাসিক বিবরণ বিভিন্ন উপাদান গুলিতে রয়েছে তা প্রমাণ করে যে উৎকল ব্রাহ্মণ দের সম্পর্কে এ ধরনের বিশ্লেষণ সঠিক নয় বরং একথা বলা যায় যদি বাঙালি জাতিকে অরণ্যানীর সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে উৎকল ব্রাহ্মণরা তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে মানুষ তার ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের জন্যই ক্রমশ সংগ্রাম করেছে। খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হয়েছে। এই খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই খাবারকে সুস্বাদু ও মুখরোচক করার জন্য খাবার তৈরিতে বৈচিত্র্য তথা পরিবর্তন এসেছে। ভোজনরসিক বাঙালি হিসাবে যে পরিচিতি গড়ে উঠেছে তা একদিনে হয়নি, বরং কালের নিয়মে বিবর্তনের পথ ধরে বাঙালির জীবনধারায় খাদ্যাভাসের বর্তমান রূপ স্পষ্ট হয়েছে। বাঙালির খাদ্য তালিকায় ভাত প্রথম সারিতে থাকলেও উৎকল ব্রাহ্মণদের সৌজন্যে 'পিঠে' খাদ্য উপাদান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এই পিঠে তৈরির বৈচিত্র্য বা বাহার বাঁকুড়ার উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজকে বিশিষ্টতা দান করেছে। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজের মানুষেরা রান্না করার কাজে খুবই ওস্তাদ। স্বাভাবিকভাবেই তারা ভোজনরসিক হবেন সেটাই স্বাভাবিক, কারণ তিনিই ভালো রান্না করতে পারবেন যিনি সেই পদের সঠিক স্বাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আর এই সূত্রে উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজের মানুষ সারাবছরই তাদের খাদ্য তালিকা অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি পিঠে তৈরিতেও দক্ষতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছেন। একটু অন্য ভাবে বললে বলা যায় উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কৃতিতে পিঠে তৈরি অন্যতম প্রধান অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

লোকসংস্কৃতি বলতে সাধারণত লোকসমাজের সংস্কৃতিকে বোঝায়। লোক বলতে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী; যারা সাধারণত গ্রামে বসবাস করে এবং কৃষিকাজকে তাদের প্রধান জীবিকারূপে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ এক বিশেষ ভৌগোলিক সান্নিধ্যে একে অপরের পরস্পরের দৈনন্দিন আদান প্রদানে অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠীকে আমরা লোক অর্থে বিশেষিত করতে পারি। লোকবিশ্বাস, লোকাচার, লোকসংস্কার, যাদুবিদ্যা, ছড়া, প্রবাদ প্রবচন, বাগধারা, ব্রত, পার্বণ, লোকক্রীড়া, লোকক্রিয়া, লোক উৎসব, ম্যাজিক, লোকনৃত্য, লোককথা, লোকশিল্প (যথা – মুখোশ), লোকসংগীত, খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি বিষয় অর্থাৎ আমরা লৌকিক জীবনে যা যা বিষয় গ্রহণ করি তাই লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত। এই দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করলে উৎকল সমাজের পিঠের সাতকাহনও লোকসংস্কৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

লোকসংস্কৃতি কোনো সংকীর্ণ পরিসরের বিষয় নয়, এর বিস্তৃতি হয়েছে বৃহত্তর জগতে। এই লোকসংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে লোকসাহিত্য। যা সকল প্রকার সাহিত্যের ভিত্তিভূমি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "লোকসাহিত্য" (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধগ্রন্থের 'গ্রাম্যসাহিত্য' (ভারতী, ফাল্গুন – চৈত্র ১৩০৫) প্রবন্ধে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন — "গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার

অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনই সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয় স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য আয়ত্তগম্য; সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশে সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপরে দাঁড়াইয়া। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুল-ফল ডাল-পালার সঙ্গে মাটির নিচেকার তুলনা হয় না; তবু তত্ত্ববিদদের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিচ্ছুতেই ঘুচিবার নহে।

নিচের সহিত উপরের এই যে যোগ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা ধনীসভার কবি; যদিচ তাঁহারা উভয়েই পণ্ডিত; সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশিদূর ছড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গল কুমারসম্ভবের ছাঁচে গড়া হয় নাই। তাহার দেবদেবী বাংলাদেশের হর-গৌরী, কবিকঙ্কণ চন্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্য পীরের কথা সমস্তই গ্রাম্যকাহিনি অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়। রাজসভার কাব্য চন্দ্র মিল ও কাব্যকলা সুসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রাম্য ছড়াগুলির সহিত তাহার মর্মগত প্রভেদ ছিল না। অনুরূপভাবে বাঁকুড়া জেলার লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবেই উৎকল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের তৈরি পিঠে বাঙালির রসনাকে অনেকটাই পরিতৃপ্ত করেছে। আর উৎকল ব্রাহ্মণরা সারা বছরের বিভিন্ন সময়ে নানান ধরনের পিঠে তৈরি করে থাকেন। পিঠের বাহার এ কথাই প্রকাশ করে যে খাদ্য সামগ্রীকে কতরকম ভাবে খাওয়া যায়।

উৎকল ব্রাহ্মণরা যে সমস্ত পিঠে তৈরি করে থাকেন সে আলোচনার প্রথমেই বলা যায় সাধারণভাবে পিঠে তৈরিতে প্রধান উপাদান হিসাবে আতপ চালের গুঁড়ো বা গুঁড়ি, তেল বা ঘি, চিনি বা গুড়, ডাল জাতীয় বিভিন্ন শস্য এবং শীতকালীন সবজি ও অন্যান্য উপাদান যেমন তালের মাড়ি, কাঁঠাল, খই প্রভৃতি জিনিসগুলিও পিঠের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যে উপাদান দিয়ে পিঠে তৈরি করা হয়, পিঠের নামকরণের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

১) মুগের বড়া: গোটা মুগ ডালকে জাঁতার সাহায্যে ভেঙ্গে ভেজানো হয়, তারপর ভেজানো মুগকে ভালো করে ধুয়ে নিলেই তার ছাল আলাদাভাবে জলে ভেসে যায়। এবার মুগ ডালকে শিল নোড়া বা মিক্সার গ্রাইন্ডারে ভালো করে বেঁটে নিতে হয়। বাটা মুগ ডাল এমন হতে হবে তা যেন পকোড়া ভাজার মতো পুরু মিশ্রণ হয়। তেলে ভাজার আগে অন্য পাত্রে চিনির রস প্রস্তুত করে রাখতে হয়। ভালো করে তেলে বা ঘিয়ে ভেজে ঐ ভাজা বড়া গুলি চিনির রসে চুবিয়ে রাখতে হয়। ঠান্ডা হলে তা খাওয়ার জন্য পরিবেশন করা হয়। সারা বছরই তা তৈরি হয়ে থাকে।

২) রমার বড়া ও মটরের বড়া: মুগের বড়া তৈরির পদ্ধতির মতো পদ্ধতি অবলম্বন করে রমার বড়া ও মটরের বড়া তৈরি করা হয়ে থাকে। এই পিঠে গুলি সারা বছরই তৈরি করা হয়ে থাকে।

৩) আলুর বড়া: স্বাদ বদল এবং বিশেষ করে যে সমস্ত মানুষজন নুন-ঝাল পছন্দ করেন তাদের খাদ্য তালিকায় মাঝে মাঝেই আলুর বড়া স্থান পায়। আলুর বড়া তৈরির জন্য প্রথমে আলু সেদ্ধ করা হয়। তারপর সেদ্ধ আলু ঠান্ডা হলে তাতে আতপ চালের গুঁড়ো মিশিয়ে মাখন তৈরি করা হয়। এই মাখনের সঙ্গে আদা,

জিরে, ধনে এবং পরিমাণ মতো লবণ মেশানো হয়। মিশ্রনে ধনেপাতা কুচি করে এবং সামান্য পরিমাণে বিরি কলাই বা বিউলির ডাল বাটা মিশিয়ে দিয়ে তা ভাজলে স্বাদ আরো বেশি হয়। পাকোড়া ভাজার মতো করে তেলে ভাজার পর আলুর বড়া তৈরি সম্পন্ন হয়। এই পিঠে তৈরি সারা বছর হয়ে থাকে।

৪) কুমড়ো বড়া: এই পিঠে তৈরির জন্য পাকা কুমড়ো সেদ্ধ করে তৈরি করা হয়। তবে কুমড়ো ও চালের মিশ্রণে সামান্য পরিমাণে চিনি বা গুড় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাকি তেলে ভাজার পদ্ধতি আলুর বড়ার মতোই। বড় মাপের ভালো মানের পাকা কুমড়ো সারা বছরই পাওয়া যায় তাই ইচ্ছে হলেই এই পিঠে বানানো যায়।

৫) বাঁধাকপির বড়া: শীতকালের অন্যতম প্রধান সবজি বাঁধাকপি। তাই শীতকালে আলুর বড়ার পরিবর্তে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে বাঁধাকপির বড়া তৈরি করা হয়ে থাকে।

৬) সিম চাকলি: শীতের অন্যতম সবজি সিমকেউ পিঠে তৈরীর উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথমে সিমগুলি সেদ্ধ করে তার দু দিকের সিটে বা তন্তুগুলিকে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর চালের গুঁড়ি, আদা, জিরে, লঙ্কা, লবণ মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা হয়। মিশ্রণটিকে তাওয়া বা তোয়ার উপর তেল দিয়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। অত্যন্ত মুখরোচক এই পিঠে শীতকালে কৃষিজ পণ্য উৎপাদনকারী উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজের অনেক বাড়িতেই হয়ে থাকে।

৭) লাউয়ের চাকলি: লাউয়ের চাকলি তৈরি করার পদ্ধতি সীমের চাকলির মতোই। কেবল এক্ষেত্রে সীম সেদ্ধ না করে লাউ সেদ্ধ করতে হবে।

৮) বাঁধাকপির চাকলি: বাঁধাকপির চাকলি তৈরি করার পদ্ধতি সীমের চাকলির মতোই। এক্ষেত্রে সীম সেদ্ধ না করে বাঁধাকপি সেদ্ধ করতে হবে।

৯) খইয়ের বড়া: এই পিঠে তৈরিতে প্রধান উপাদান খই ও চালের গুঁড়ো। খইকে ভিজিয়ে তার সঙ্গে চালের গুঁড়ো, বিরি বাঁটা, আদা, জিরা, লঙ্কা, লবণ মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে আলুর বড়া যেভাবে ভাজা হয়, এই পিঠে তৈরিতেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

১০) কাঁঠাল বড়া: পাকা কাঁঠাল এই পিঠে তৈরীর প্রধান উপাদান। কাঁঠালের কোষগুলি থেকে বীজ আলাদা করার পর পরিমাণ মতো চালের গুঁড়ো, সামান্য পরিমাণে চিনি বা গুড় মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে ভাজা হয়।

১১) তালের বড়া চাকলি ও পাতাসেদ্ধ: উৎকল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পিঠে তৈরিতে বর্ষার সময় অন্যতম উপাদান হিসেবে তালের ব্যবহার হয়ে থাকে। পাকা তাল থেকে মাড়ি বের করার পর তা ভালো করে ফুটিয়ে সেদ্ধ করা হয়। এরপর তা ঠাণ্ডা হলে চালের গুঁড়ি মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা হয়। ইচ্ছে অনুযায়ী পিঠে বানানো যায় যেমন পকোড়ার মতো ভাজা হলে তা হল তালের বড়া আর তোয়াতে পাতলা করে মেলে তা ভাজার মত করা হলে তা চকলি বা তালের চাকলি নামে পরিচিত হয়। আর পাতাসেদ্ধ পিঠে বানানোর পদ্ধতিটি একটু আলাদা। প্রথমে মিশ্রণটিকে শাল, বট, কাঁঠাল, চালতা এইগুলির যেকোনো একটি পাতায় মোড়া হয়, তারপর ওই পাতা শুদ্ধ মিশ্রণটিকে সেদ্ধ করা হয়। এক্ষেত্রে হাঁড়িতে জল ফুটিয়ে বাষ্পকে ব্যবহার করা হয়। এই পিঠে গুলি খুবই সুস্বাদু।

১২) চালের রুটি: যেসব পিঠেগুলি তৈরিতে একমাত্র উৎকল ব্রাহ্মণরা তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল চালের রুটি। প্রথমে একটি পাত্রে জল গরম করতে দিতে হয়। জল ভালো গরম হলে আতপ চালের গুঁড়ো মিশিয়ে বেশ কিছুক্ষণ মিশ্রণটিকে নাড়াচাড়া করতে হয়। এখন মিশ্রণটি আটা রুটি তৈরির মতো মণ্ড হিসাবে তৈরি হয়ে যায় তখন তাকে উনুন থেকে নামানো হয়। এরপর চাকি ও বেলন দিয়ে রুটির মতো বেলে তোয়াতে দেওয়া হয়। ভালো করে সেঁকা হলে রুটি তৈরি সম্পন্ন হয়।

১৩) কাখরা পিঠে: এই পিঠে তৈরির প্রাথমিক প্রক্রিয়াটি চালের রুটি তৈরির মতোই। শুধুমাত্র মণ্ড তৈরিতে চিনি বা গুড় ব্যবহার করা হয়। মিশ্রণকে উনুন থেকে নামানোর পর লুচির মতো করে বেলা হয়। তারপর তেল কিংবা ঘি দিয়ে ছাঁকা হয়। অনেক সময় বেলার পর একটির উপর চাঁছি বা খোয়া ক্ষীর কিমবা ছানা দিয়ে আরেকটি চাপা দেওয়া হয়। এরপর দুটিকে এমনভাবে জোড়া লাগানো হয় যাতে গরম তেল বা ঘি এ ভাজার সময় পুর বেরিয়ে না যায়। উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজের ঐতিহ্যশালী পিঠে গুলির মধ্যে অন্যতম হল কাখরা পিঠে। অনেক উৎসব অনুষ্ঠানে এবং সামাজিক বিয়ের অনুষ্ঠানের পাকা দেখার দিন এই পিঠে তৈরি অবশ্যই হয়ে থাকে।

১৪) আরশা বা গুড় পিঠে: গুড় এবং চালের গুঁড়ো মিশিয়ে এই পিঠে তৈরি করা হয় বলে এই পিঠের এরূপ নামকরণ। প্রথমে একটি পাত্রে গুড় গরম করা হয় তারপর তাতে গুঁড়ি মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণকে ভালো করে মাখার পর কোন তৈলাক্ত পাতার উপর চাপ দিয়ে পাতলা করে গরম তেলে ভাজা হয়। শীতকালে নলেন গুড় বা খেজুর গুড় ব্যবহার করে এই জাতীয় পিঠে তৈরি করা হয়ে থাকে, যা দারুন সুস্বাদু এবং সুগন্ধী। এই পিঠে তৈরি করার দু-তিনদিন পর খাওয়া হলে তার স্বাদ যেন আরো বেশি হয়।

১৫) চিত পিঠে: শুধুমাত্র চালের গুঁড়ো, লবণ ও জল দিয়ে চিত পিঠে তৈরি করা হয়। পাতলা মিশ্রণ তৈরির পর মাটির খোলায় এই পিঠে তৈরি হয়। খোলাকে ঢাকা দেওয়া হয় সরা দিয়ে। এই দুটি জিনিসের সংযোগস্থল ভিজে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। উনুনের আঁচ ওই ভিজে কাপড়ের জল শোষণ করে মাটির খোলার মিশ্রণকে সেদ্ধ করে। চিৎ পিঠে তৈরি সম্পূর্ণ করে।

১৬) গড়গড়িয়া পিঠে: গড়গড়িয়া পিঠে তৈরির বিষয়ে প্রাথমিক পদ্ধতি রুটি পিঠের মতোই। জল ও চালের গুঁড়ো গরম করে মিশ্রণটি তৈরি হয়ে গেলে তা ছোট ছোট পরিমাণে বের করে দু'হাত দিয়ে খোল তৈরি করা হয়। খোলের ভিতর পুর দেওয়া হয়। তারপর মুড়ে দিয়ে তৈরি গরম জলে ছাড়া হয়। সেদ্ধ হয়ে গেলে পিঠে গুলি জলের উপরে ভেসে ওঠে, তখন জল থেকে তুলে নিয়ে কলাপাতায় রাখা হয়। পিঠের সঙ্গে থাকা জল ঝরে যাওয়ার পর ডালি বা থালায় রাখা হয়। পুর হিসাবে চিনি মিশ্রিত চাঁছি বা খোয়া ক্ষীর, নারকেল এবং অনেকে ক্ষেত্রে কলাই ব্যবহার করা হয়। গাড়ির চাকার মত গড়িয়ে যেতে পারে এরকম দেখতে হয় বলে এই পিঠের এরূপ নামকরণ হয়েছে বলে অনেকেই বলে থাকেন।

ভোজনপ্রিয় উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজের খাদ্য তালিকায় পিঠের সমগোত্রীয় হিসাবে আরো দুই ধরনের জিনিস গুরুত্বপূর্ণ স্থানেই রয়েছে যথা – গমের শীতল ও ছানা শীতল।

গমের শীতল তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে আটা কে ভালো করে ভেজে নেওয়া হয়। তারপর জল দিয়ে শক্ত করে মেখে নেওয়া হয়। ঐ মাখনকে চাকি-বেলন দিয়ে পুরু করে মেলে পিস পিস করে হালকা আঁচে ভালো করে ভেজে নিতে হয়। ঐ ভাজা গুলিকে পরে চিনির পুরু রসে বা কড়া রসে মাখিয়ে নেওয়া হয়।

ছানা শীতল তৈরির ক্ষেত্রে শুকনো (জলহীন) ছানার সঙ্গে সামান্য পরিমাণে সুজি, চিনি ও ময়দা মিশিয়ে ভালো করে মিশিয়ে মণ্ড তৈরী করা হয়। এরপর ঐ মণ্ড থেকে ছোট ছোট টুকরো নিয়ে তাকে গোল কিমবা চ্যাপ্টা করে ভাজা হয়। ঐ ভাজা গুলিকে চিনির রসে ভিজিয়ে ছানা শীতল তৈরি সম্পন্ন হয়।

বর্তমান সভ্যতা অত্যধুনিক হওয়ার সাথে সাথে প্রতি নিয়ন্তর বা কালের আবর্তনে প্রকৃতির সঙ্গে মানব সভ্যতার মনোজগতের নানান পরিবর্তন ঘটে চলেছে। মানুষের আচার বিচার, কথাবার্তা, খাদ্যাভাস, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির নানান পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বর্তমানে মানুষ ভুলতে বসেছে খেলাধুলার ঐতিহ্য, প্রবাদ প্রবচন, লোকগীতি, লোককথা, লোকশিল্প প্রভৃতি। খাদ্যাভ্যাসে পড়েছে আমূল পরিবর্তন, এসেছে বিদেশি খাবারের বাহার। মানুষ সেই অতীতের মতো উনুন জ্বেলে খাদ্যের বাহার তৈরি করতে অনিচ্ছুক। এর ব্যাপক প্রভাব উৎকল সমাজের পিঠের উপর পড়েছে। অতীতে উৎকল সমাজের প্রতি ঘরে ঘরে প্রায়শই হরেকরকম পিঠের আসর বসত। উৎসব অনুষ্ঠানে তো কথাই নেই, আট দশ প্রকারের পিঠে তৈরি হত। অনেক মানুষজনদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতো। বর্তমানে তা কল্পনাতীত। খাওয়ার জন্য পিঠের তেমন আসর বসায়নি। বিভিন্ন পূজা পার্বণে নিয়মরক্ষার জন্য সামান্য পরিমাণে পিঠের আয়োজন করে। তবে এই কথাও ঠিক যে, বর্তমানে বিভিন্ন কারণবশত পিঠে তৈরিতে অনীহা দেখালেও অন্যান্য লোকসংস্কৃতির মতো বিলুপ্তপ্রায় হয়ে ওঠেনি। আজও তারা বিভিন্ন উৎসবে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, বাড়িতে আত্মীয় স্বজন এলে এমনকি নিজেদের খাবার ইচ্ছে হলেও পিঠের বাহার তৈরি করে। তাদের তৈরি পিঠে নানা স্থানে, নানা সমাজে গুণগ্রাহী। অনেক মানুষজন বলেন পিঠের মধ্য দিয়ে উৎকল সমাজকে চেনা যায়। এই প্রবন্ধে যে যে পিঠে উৎকল সমাজে ব্যাপক প্রচলিত সেইগুলি আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও আরও হরেকরকম পিঠে উক্ত সমাজ তৈরি করে নিজেদের পরিচয়বহন করে চলেছে। এইভাবে পিঠের মধ্য দিয়ে উৎকল সমাজ নিজেদের লোকসংস্কৃতির ধারাটিকে আপন বেগে বহন করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয়, উৎকল ব্রাহ্মণদের তৈরি কাখরা ও গড়গড়িয়া পিঠে G.I ট্যাগ স্বীকৃতির জন্য আবেদন করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজের খাদ্য তালিকার অন্যতম উপাদান পিঠে সম্পর্কে আলোচনায় যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছি তার জন্য কয়েকজনের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি নিজে উৎকল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও এবং আলোচিত সব পিঠেগুলো স্বাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেও সেগুলির তৈরি কৌশল সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানিনা বললেই চলে। সে কারণে এই আলোচনা সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন আমার মা ফুলকুমারী হোতা (বয়স ৬৯), আমার মামিমা শুভঙ্করী সিংহ মহাপাত্র (বয়স ৬৭), আর আমার ভ্রাতৃপ্রতিম ড. প্রদীপ কুমার পাত্র মহাশয়। প্রদীপবাবু উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজের পিঠে নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা করেছেন যা আমাকে অবশ্যই এই লেখা সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করেছে। এদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. তুষার চট্টোপাধ্যায়; লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান; এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ; কলকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৪০৯ বঙ্গাব্দ

২. পল্লব সেনগুপ্ত; লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ; পুস্তক বিপণি; কলকাতা; ১৯৯৫

৩. যোগেশরঞ্জন পাঠক; লোকসংস্কৃতির দর্পণে; পুস্তক বিপণি; কলকাতা; ১৪০১ বঙ্গাব্দ

৪. শিপ্রা ঘোষ; লোকসংস্কৃতির আঙিনায়; পুস্তক বিপণি; কলকাতা; ১৯৯৭